৯.১.১. ওয়াহাবী আন্দোলন

ওয়াহাবী ছিল মুসলমানদের একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রবর্তক ছিলেন আব্দুল ওয়াহাব। তাঁর অনুগামীদের বলা হত ওয়াহাবী। ওয়াহাবীদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনের পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ। সৈয়দ আহমদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের (Islamic revivalism) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থিতি ছিল স্পষ্ট। তিনি ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী

লেন। তিনি বলতেন—ভারতবর্ষ দার-উল-হারব বা শত্রুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষকে র-উল-ইসলাম বা ধর্মরাজ্যে পরিণত করতে হবে। সৈয়দ আহ্‌মেদের অনুপ্রেরণায় উত্তর ারতে ওয়াহাবী আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নিজের মতাদর্শ প্রচার রতে করতে তিনি ১৮২১ খৃঃ কলকাতায় আসেন। কলকাতায় বারাসত অঞ্চলের অধিবাসী ীর নিসার আলি সৈয়দ আহ্‌মদের প্রভাবে ওয়াহাবী মতাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এই মীর নিসার আলি। তিতুমীর নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

তিতুমীর ১৭৮২ খৃঃ উত্তর চব্বিশ পরগণার নারকেলবেড়িয়ার কাছে চাঁদপুর গ্রামে এক গৃহস্থ র্যীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি নদীয়ার বিভিন্ন জমিদারের অধীনে লেঠেলের াজ করেছিলেন। ফলে দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সময় জমিদারী ত্যাচারের স্বরূপ তিনি জানতেন। যৌবনে তিনি হজ করতে মক্কা গিয়েছিলেন। অনেক তিহাসিকের মতে—মক্কাতেই তিতুমীর প্রথম ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহ্‌মদের সংস্পর্শে সেছিলেন। মক্কা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আর জমিদারীতে কাজ করলেন না। রিদ্র মুসলমান চাষী ও জোলা (তাঁতী)দের মধ্যে তিনি ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন এবং তাদের য়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। গোবরডাঙা-নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলেই তিনি ক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মীয় সংস্কারকের। বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট লভিন ১৮৩২ খৃঃ তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—ওয়াহাবীরা ইসলাম ধর্মের অবিকৃত পবিত্রতা তিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। তারা মূর্তিপূজা, বিভিন্ন কুসংস্কার, পীরের পূজা এবং সুদের কারবারের ার বিরোধী। পোশাক এবং সাজসজ্জার দিক দিয়ে তারা অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র। ারা মাথা কামায় এবং বিশেষ ধরনের দাড়ি রাখে।

তিতুমীর ও তাঁর অনুগামীরা অন্যান্যদের তাঁদের ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করতে প্রয়াসী য়েছিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান চাষী এবং জোলা ওয়াহাবী মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারীতে পুঁড়া গ্রামে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বারাসত অঞ্চলের ন্যান্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে ও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ওয়াহাবীদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার ফলে ারা ঐ এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। এই কর্তৃত্ব সহ্য করতে রাজী ছিলেন না জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। ওয়াহাবীদের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য তিনি ওয়াহাবী মতাদর্শে বিশ্বাসীদের দাড়ির ওপর আড়াই টাকা কর ধার্য করেন। কৃষ্ণদেব রায়ের পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত য়ে পার্শ্ববর্তী কুরগাছি এবং নগরপুর অঞ্চলের জমিদারেরাও ওয়াহাবীদের প্রভাব খর্ব করতে স্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে জোর করে জরিমানা আদায় রতে থাকেন এবং তাঁদের প্রতি নানারকম দুর্ব্যবহার করেন। ওয়াহাবী ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা ভিযোগ করেছিল যে জমিদারের লোকেরা কেবলমাত্র তাঁদের কাছ থেকে বলপূর্বক জরিমানা াদায় করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা মাঝেমধ্যেই তাঁদের দাড়ি উপড়ে নিত। দরিদ্র কৃষকেরা ই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মনস্থ করে। কৃষক প্রতিরোধের ম্মুখীন হয়ে কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের গ্রাম আক্রমণ করেন এবং তাঁর পাইক ও রিন্দাজেরা সেই গ্রামের একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে। মসজিদ পোড়ানোর দ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—"সম্ভবতঃ জমিদারের ধারণা ছিল,

ওয়াহাবীদের জমায়েত ও শলাপরামর্শের একটা প্রধান কেন্দ্র এ মসজিদ পুড়িয়ে দিলে তাদের সংগঠন বেশ কিছুটা দুর্বল হবে।"

এরপর দ্রুত ঘটে যাওয়া কতকগুলি ঘটনা ওয়াহাবীদের অসন্তোষকে একটি সংগঠিত প্রতিরোধে রূপান্তরিত করে। ওয়াহাবীরা মসজিদ পোড়ানোর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। কিন্তু জমিদার কৃষ্ণদেব রায় থানার দারোগা রামরতন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। তারপরই তিনি ওয়াহাবীদের দমন করার ব্যাপারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের হাতে প্রজা দমন করার বিপুল ক্ষমতা দিয়েছিল। বিশেষতঃ 'হপ্তম' অর্থাৎ ১৭৯৯ খৃঃ ৭ নং রেগুলেশন ছিল খাজনা দিতে অনিচ্ছুক বিরোধী প্রজাদের শায়েস্তা করার একটি মারাত্মক অস্ত্র। কৃষ্ণদেব রায় এই অস্ত্র প্রয়োগ করলেন এবং খাজনা না দেবার মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করে একদল ওয়াহাবী কৃষককে কাছারিতে ধরে এনে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালালেন। এইবার ওয়াহাবীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিতুমীর ও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণদেব রায়ের বাসস্থান যে গ্রামে ছিল অর্থাৎ পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ করেন এবং সেখানে একটি বাজারে গো-হত্যা করে তার রক্ত নিকটবর্তী একটি মন্দিরের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাছাড়া বিদ্রোহীরা বাজারের বেশকিছু দোকানও লুণ্ঠন করেন।

১৮৩১ খৃঃ নভেম্বর মাসে বারাসত অঞ্চলের ওয়াহাবী বিদ্রোহ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। পুঁড়ার পর বিদ্রোহীরা লাওঘাটি এবং রামচন্দ্রপুর গ্রাম দুটি আক্রমণ করেন। ক্রমে জমিদার বিরোধী এই কৃষক অভ্যুত্থান একটি রাজবিরোধী বৃহত্তর সংগ্রামের চরিত্র ধারণ করতে আরম্ভ করে। স্থানীয় জমিদারেরা এবং রাষ্ট্রশক্তি বিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৮৩১ খৃঃ ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্র জমিদারদের স্বপক্ষে এবং বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করে। বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট কলভিন প্রায় ১২৫ জন সিপাহী ও বরকন্দাজ নিয়ে তিতুমীরের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য নারকেলবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত হন। সরকারী অভিযান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন এবং গোলাম মাসুম নামে জনৈক কৃষককে তাঁদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা কলভিনের বাহিনীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং প্রচুর সিপাহী ও বরকন্দাজকে হত্যা করেন। তারপর বিদ্রোহীরা বসিরহাট থানার দারোগা রামরতন চক্রবর্তীকে হত্যা করেন। এই রামরতন চক্রবর্তীর চক্রান্তেই কৃষ্ণদেব রায় মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিলেন। বিজয়গর্বে উৎফুল্ল বিদ্রোহীরা তারপর ইছামতী নদীর তীরবর্তী নীলকুঠিগুলি একের পর এক ধ্বংস করলেন ও অগ্নিদগ্ধ করলেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ নীলকুঠিরই মালিক ছিলেন ডেভিড অ্যান্ডুইজ নামে এক ইংরেজ। নীলকুঠিগুলির ইংরেজ তত্ত্বাবধায়করা বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। উইলিয়াম হান্টার বারাসতের বিদ্রোহকে একটি জমিদার-বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন—এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারী রাজস্ব দপ্তরের, নীলকুঠিগুলির এবং জমিদারের কাছারিবাড়ির যাবতীয় নথিপত্র ধ্বংস করা। সমসাময়িক *Calcutta Gazette*-এ লেখা হয়েছিল—তিতুমীরের অনুগামীরা নীলকুঠিগুলির নথিপত্র

ধ্বংস করেছিলেন, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া।

কেবলমাত্র যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনীর প্রতিরোধের মধ্যে বা দারোগা হত্যার মধ্যেই ওয়াহাবী বিদ্রোহের রাষ্ট্রবিরোধী চরিত্র প্রতিফলিত হয় নি। বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিতু ঘোষণা করেছিলেন কোম্পানির সরকারের অবসান আসন্নপ্রায়। বিদ্রোহী দরিদ্র মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিতু বারাসত অঞ্চলে একটি বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেন। সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে ওয়াহাবীরা তাঁদের বাঁশের কেল্লায় একটি পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। তিতুমীর বাদ্‌শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। বিহারীলাল সরকার প্রণীত **তিতুমীর** গ্রন্থে উল্লিখিত প্রচলিত এক কাহিনী অনুযায়ী মইনুদ্দিনের বাড়িতে তিতুমীরের অভিষেক অনুষ্ঠান মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়েছিল। ওয়াহাবী রাজের অধীনে একটি সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। তিতুর প্রধান উপদেষ্টা হন মিশ্‌কিন শাহ্ নামে এক ফকির এবং মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন মৈনুদ্দিন (মতান্তরে মৈজুদ্দিন) নামে এক দরিদ্র জোলা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের বলা হত সর্দার। তাঁরা সকলেই এসেছিলেন দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে। তিতুমীর তাঁর নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাসিন্দাদের জমিদারের কাছে খাজনা দিতে নিষেধ করেন এবং নিজে তাদের কাছ থেকে খাজনা বা 'মালগুজারী' দাবী করেন। তাছাড়া বিভিন্ন জমিদারের কাছে পরোয়ানা জারী করে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য দাবী করা হয়েছিল। **সমাচার চন্দ্রিকা** লিখেছিল—যেসব জমিদারেরা ওয়াহাবীদের এই দাবী অনুযায়ী কাজ করেন নি, তাঁরা বিদ্রোহীদের হাতে চরম হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। তবে সাধারণতঃ ছোট জমিদারেরা বিদ্রোহীদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন, বড় জমিদারেরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাঁদের পরিবারের লোকজনদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীরের বিদ্রোহকে দমন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ১৮৩১ খৃঃ ১৪ই নভেম্বর এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী নারকেলবেড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে কামান ব্যবহার করে। বিদ্রোহীদের পক্ষে কামানের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয় নি। কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাও বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উন্নতমানের সামরিক সরঞ্জামের সামনে তাঁদের প্রতিরোধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। তিতুমীর ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রায় আটশ জন অনুগামীকে বন্দী করা হয়। বন্দীদের বিচার হয়। বিচারে তিতুর সেনাপতি গোলাম মাসুমের ফাঁসীর হুকুম হয়। অন্যান্যদের অধিকাংশকেই দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ শাসকেরা বাংলার ওয়াহাবী অভ্যুত্থান দমন করেন।

সমসাময়িক **সমাচার চন্দ্রিকা** ওয়াহাবী বিদ্রোহকে মুসলিম সম্প্রদায়ের হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে দেখেছিল। সাম্প্রতিককালের কিছু গবেষকও উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিতুমীরের সংগ্রামের মধ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিপ্রসূত কার্যকলাপ খুঁজে পেয়েছেন। আবার পাকিস্তানের একদল ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ

ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী অত্যন্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে ওয়াহাবী বিদ্রোহের মূল বিষয় ছিল জমিদার বিরোধী ও ইংরেজ সরকার বিরোধী গণসংগ্রাম। রণজিৎ গুহ বলেছেন—ওয়াহাবী অভ্যুত্থান ছিল নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ইজ্জতরক্ষার লড়াই। ওয়াহাবী বিদ্রোহী পরিচালিত বিধ্বংসী কার্যকলাপ ও লুণ্ঠনের মধ্যে অধ্যাপক গুহ শত্রুপক্ষের ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রতীকগুলি ধ্বংস করে নিজেদের নিম্নবর্গীয় পরিচিতি (subaltern identity) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস খুঁজে পেয়েছেন। সুপ্রকাশ রায়ের মতে এই বিদ্রোহ ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রাথমিক স্তর। ওয়াহাবী বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। ওয়াহাবীদের বিচার-সংক্রান্ত দলিলগুলি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে হিন্দু জমিদারই প্রথম ওয়াহাবীদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেন এবং তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসারেই ওয়াহাবীরা প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠেন। কিন্তু অচিরেই ধর্ম তাঁদের জমিদার ও রাষ্ট্রবিরোধী মতাদর্শে রূপান্তরিত হয়। ওয়াহাবী বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে ডব্লু. সি. স্মিথ (W. C. Smith) তাঁর *Modern Islam in India : A Social Analysis* গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছেন। স্মিথ লিখেছেন—"এই বিদ্রোহ ধর্মীয় ছিল, তবে সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ছিল না। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা কোথাও-ই নিম্নশ্রেণীভুক্ত মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি। নিম্নবর্গের মুসলমানরা অর্থনৈতিক বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষায় প্রয়াসী হয় নি। কৃষক হিসাবে ওয়াহাবীদের শ্রেণীচেতনাই আন্দোলনের মূল গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল" (The movement though religious was not simply communalist. The movement..... did not set the lower class Muslims against lower class Hindus in open conflict, nor did it divert the lowest class Muslims from economic issues to a false solidarity with their communal friends but class enemies.)। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন যে প্রচুর দরিদ্র হিন্দু তিতুমীরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। আবার বহু মুসলিম ভূস্বামীও ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হন। সুতরাং এই বিদ্রোহ ধর্মকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হলেও ক্রমেই তা সংকীর্ণ ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে দরিদ্র মানুষের জমিদার ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীকে অনুসরণ করে বলা যায়—ওয়াহাবী বিদ্রোহের মধ্যে আদৌ মুসলিম সাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল না। যে ধর্ম বিদ্রোহীদের প্রভাবিত করেছিল সেই ধর্ম তাঁদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এক কৃষক-বিদ্রোহ।